ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1166-1178
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.118

রবীন্দ্রনাটক এবং গুপী-বাঘা ত্রয়ী

অর্ঘ্যদীপ ব্যান্যার্জী, *সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.05.2025; Accepted: 24 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

Rabindranath Tagore & Satyajit Ray, two legendary personae in area of Art & Culture. There are many similarities we can find between them through their art form & content. In this particular essay we are trying to imply a comparative study on their art & thought process, especially political. State & Nation are the key words here. We have chosen allegorical dramas (mainly) of Tagore and so-called childrens' films (Gupi Bagha Trio) of Ray, as main texts to decode their ironies & allegories in these. Also have highlighted the usage or requirments of this kind of symbolic play work. This kind of exercise is not only for art's sake but also for political reason, but not the sake of typical party politics, here canvas is vast. Both of them are addressed as Humanist (though loosely), so their political view is manifestation of Mankind, and it's also a part of their own philosophy. Here we will discuss the 'Political Philosophy'.

Keywords: Tale, Symbol, State, Nation, Humanism, Interpretation

প্রভাব' শব্দটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ। বস্তুত শিল্প অনুকরণ কি না, তা নিয়ে প্রাচীন গ্রিসে কম বাকবিতণ্ডা হয়নি। যদিও এই অনুকরণ প্রকৃতি সংলগ্ন। পরবর্তী সময়ে যখন অনুকরণের পরিবর্তে অনুসরণ ব্যবহৃত হতে লাগল, তখন তা জড়িয়ে গেল ঐতিহ্য এবং পরম্পরার সঙ্গে। এর মধ্যে যেমন পাঠ ও প্রকাশ সূত্রে উত্তরাধিকারীর বার্তা তেমনই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও মিশে থাকে। এইবার এল প্রকৃতি থেকে পরিবেশ সংলগ্নতা। বিতর্ক সত্ত্বেও ইয়ুং কথিত সমবেত নিশ্চতনের প্রত্ন ছাঁদকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এর সঙ্গে। ফলত ব্যাপারটিকে প্রভাবের থেকে অন্তর্বয়ান সম্বোধনই অধিক সঙ্গত।

সেই অন্তর্বয়ানের মাধ্যমেই আমরা এখানে দেখতে চাইব দুটি ভিন্ন সংরূপের শিল্পকে। এখানে একইসঙ্গে মিশে গেছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংলগ্নতা। দু'জন শিল্পীর দুটি পরিবারের শিক্ষা রুচি এবং উভয় পরিবারের যোগাযোগও লক্ষণীয়। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পাঠ-ভাবনা বাসা বাঁধে উত্তরসূরির নিশ্চেতনে। তার প্রকাশ ঘটে শিল্পে। এর একটি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন –

> "এই ছবিটির উল্লেখ অন্য কারণেও এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হয়, কেননা একদিকে যেমন এর বিষয়বৃত্ত থেকে কখনো কখনো মনে পড়ে 'রক্তকরবী'র জাল আর মাঠ, শক্তি আর শান্তির লড়াই, অন্যদিকে তেমনি এর গানে কথা-সুরের আরোপভঙ্গি মনে করিয়ে দেয় রাবীন্দ্রিক গীতিনাট্যগুলিকে।"[১]

আমাদের আলোচনা অবশ্য গীতিনাট্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উপরন্তু তথাকথিত তত্ত্ব নাটকই আমাদের লক্ষ্য। অন্যদিকে গুপী-বাঘা ত্রয়ী, এর প্রথম ভাগ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা, সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা। মধ্য ভাগ সম্পূর্ণ সত্যজিৎ সৃষ্ট এবং অন্তভাগ সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি, পরিচালনা সন্দীপ রায়ের। বৃহদর্থে আমরা এই তিনটি ছবিকে একত্রে যুক্ত করেছি।

দুই পরিবারের অন্তর্যোগের ইতিহাস দীর্ঘ। শুধু ব্রাহ্ম হবার কারণেই নয়, এই অন্তর্নিহিত যোগের কারণ নিহিত সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়। ছোট সত্যজিৎকে রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া "একটি ধানের শিষের উপরে / একটি শিশির বিন্দু"র কথা সুবিদিত। এরপরের ঘটনা সত্যজিৎ রায়ের শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান। শহর ছেড়ে সত্যজিৎ রায় যেতে চাননি প্রথম দিকে।

> "মা'র কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নাকি অনেক দিনের ইচ্ছে আমি কিছুদিন গিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকি। আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল না, কারণ কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকি এটা ভাবতে ভাল লাগত না। যাই হোক, শেষটায় তো গিয়ে হাজির হলাম শান্তিনিকেতনে।"[২]

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর যে গভীরতর লাভ হয়েছিল, তা স্বীকার করতেও ভোলেননি।

> "শান্তিনিকেতনে থাকাটা আর এক দিক থেকেও আমার জীবনে খুব কাজে লেগেছিল। আমাদের ক্যাম্পাসের চার দিকেই তো গ্রামের ছড়াছড়ি। স্কেচ করবার জন্যে প্রায়ই তখন আমরা সেইসব গ্রামে চলে যেতাম। আমি শহরে জন্মেছি বড় হয়ে উঠেছিও শহরেই। গ্রাম-বাংলার রূপ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটল।"[৩]

নাগরিক সত্যজিতের গ্রামবাংলা দেখা, একি প্রতিফলিত হয়নি অপু ত্রয়ী পর্বে, ইতালির নব্যবাস্তববাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ? নাগরিক রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন পূর্ববঙ্গে অবস্থান, পরবর্তী সময়ে বোলপুরে। তবে সত্যজিত পাশাপাশি এও বলছেন –

> "শান্তিনিকেতনে থাকার একটা খারাপ দিকও ছিল। সেটা আমি অনুভব করতাম। ১৯৪১ সাল, বিশ্বযুদ্ধ একেবারে আমাদের দোড়গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে। অথচ শান্তিনিকেতনে চলছে সেই একই রকমের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা ক্যাম্পাসের মধ্যে দৈনন্দিন প্রার্থনাসভা, সংগীত কি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান – সবই একেবারে নিয়মমাফিক চলছে। চতুর্দিকের বাস্তব ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এর কোনও সংগতি আমি খুঁজে পেতাম না।"[৪]

এই নাগরিক লক্ষণ সর্বোপরি যুদ্ধের আবহ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে কলকাতা ত্রয়ী এবং সর্বোপরি গুপী-বাঘা ত্রয়ীতে। কিন্তু যুদ্ধবিমুখতা কি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না? গ্রাম্যজীবনের বর্ণনাতে কি মিশে ছিল না রবীন্দ্রনাথের নাগরিক দৃষ্টি, চেতনা?

যাই হোক, সে ভিন্ন আলোচনার প্রেক্ষিত । আমরা বরং চলে যাব সরাসরি আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রে। রূপকথার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক আখ্যান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। রূপকথার ধাঁচও চির স্থির নয়। বস্তুত আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব রাজনৈতিক ভাবনাকে যা এইসব শিল্পকর্মের অভ্যন্তরে প্রবহমান। রাজনৈতিক অবস্থান ছাড়া শিল্পও হয় না। যেমন রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত রূপক- সাংকেতিক নাটকও কী পরিমাণ রাজনৈতিক, তা লক্ষ করলেই ব্যাপারটি অনুধাবন করা যাবে। রূপকথার কথার আড়ালে থাকে রূপকের ভাঁজ। রূপকথার মধ্যেই রূপক শব্দটি রয়েছে। 'রূপক' অলঙ্কারে একটি বস্তুর গুণ অপর বস্তুতে আরোপিত হয় বা, একটি বস্তুকে অপর বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যদিও রূপকথা উদ্ভবের যে কাল, শ্রুতির সে যুগে, প্রাক-সভ্যতার সময়ে সচেতন ভাবে নিশ্চয়ই কথায় প্রতীক- রূপক ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু চেতন অচেতনের একাত্মতা পরবর্তী সময়ে কথাসমূহকে প্রতীকায়িত করে তুলেছে। অবশ্য এর পিছনে সর্বপ্রাণারোপবাদের প্রভাবই সর্বাধিক। রূপকথা প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক ন্যায় ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত। পরবর্তী কালে যখন রূপকথা মূলত রূপক হিসেবেই ব্যবহৃত হতে লাগল তখন তাতে যুক্ত হল সচেতনতা। এই দ্বিতীয় স্তরে পড়বেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর প্রমুখ। এখানে ব্যাখ্যার প্রসঙ্গও চলে আসে। রবীন্দ্রনাথ যেমন আন্ডারসনের রূপকথার আধুনিক ভাষ্য দেন 'বিম্ববতী'

('সোনার তরী' ও 'শিশু' উভয় কাব্যগ্রন্থেই সঙ্কলিত) কবিতায়। অবনীন্দ্রনাথ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ পুরোনো রূপকথার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং সেই উদ্ঘাতগুলি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। উপেন্দ্রকিশোরের লেখায় এটি পরিপূর্ণতা পেল। সত্যজিৎ অবশ্য বলছেন-

> "এমন অনেক উচুঁদরের শিশু সাহিত্য আছে যাদের পুরোপুরি রস গ্রহণ পরিণত বয়সেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এমনকী সুকুমার রায় বা লীলা মজুমদারের লেখা সম্পর্কে এই কথাই খাটে... উপেন্দ্রকিশোরের লেখার জাদুই এমনিই যে তা অনায়াসেই পাঠকের এই শিশু মনটিকে সজাগ সজীব করে তোলে।"[৫]

নিঃসন্দেহে যথাযথ উক্তি। তবে শিশু সাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথা তো কেবলমাত্র শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার আবেদন পরিণত বয়সেও থেকে যায়। 'টুনটুনির গল্প'তে টুনটুনি কি শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি নয় ? এমনকি একেবারে রূপকথাধর্মী 'ঘ্যাঁঘাসুর', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'-এ কি নেই অন্তর্নিহিত রাজনীতি ? বস্তুত শিশু সাহিত্য নামে পৃথক শ্রেণি বিভাগের প্রয়োজন আছে কি না, সেই প্রশ্নও এখন উঠছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয়রা ব্রিটিশদের চোখে ছিল শিশু। সেসময় শিশু সাহিত্যের অধিক প্রচলনের মধ্যে দেশীয় ভাবধারার পুনর্নবীকরণের দিকটিও লক্ষ করা যায়। একদিকে দক্ষিণারঞ্জন আরেক দিকে উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোরই রায় পরিবারে শিশু সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটান, যার উত্তরাধিকার সত্যজিৎ। সেই প্রথম যুগে ফ্রয়েডের আগমন তখনও ঘটেনি, তার পরে শৈশবকে আর আগের মতো দেখা হয়ত সম্ভব ছিল না। রূপকথা প্রকৃতপক্ষে কল্পনাবিলাসিতার জায়গা। বর্তমান যন্ত্র যুগে অনেকেই রূপকথা বিমুখ। কিন্তু মনে রাখতে হবে কল্পনার প্রসারতা, নীতি শিক্ষা এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এমনকি সাহসও। কারণ, রূপকথার বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় অভাব এবং তা থেকে যাত্রা। এই যাত্রা দুঃসাহসিক অভিযান যা শিশু মনে কল্পনা ও সাহসের বুনন নির্মাণ করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন রূপকথাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলে মানবমন অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়।

> "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে... রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে।"[৬]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ছদ্মবেশই রূপক। আসলে ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করলে অনেকক্ষেত্রে তার ব্যাপ্তি হয় অধিক এবং সময় পরিবর্তনের সঙ্গে তা নতুন রূপে প্রতিভাত হয়। এতে সরাসরি উল্লেখের সাংবাদিক ধরণের পরিবর্তে সাহিত্যগুণ জোরালো হয়। অনেকসময় শাসকের রক্তচক্ষুও উপেক্ষা করা যায়। আবার পূর্বে উল্লেখিত প্রত্ন ছাঁদের চিরকালীন আবেদনও এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

এই প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে চলে যাওয়া যেতে পারে রবীন্দ্র নাটকের সাজঘরে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখতে হবে এইসব নাটকের রাজা চরিত্রটি এবং তৎসংলগ্ন দর্শন-ভাবনা। 'জীবনস্মৃতি'তে দেখা যায় –

> "বাড়িতে আরো-একটা জায়গা ছিল, সেটা যে কথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই । আমার সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, "আজ সেখানে গিয়েছিলাম।" কিন্তু, একদিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ।"[৭]

- এই যে আড়াল থেকে রাজার সঙ্গে খেলা, এর যে দার্শনিক ব্যাপ্তি তার ভিতরেও ক্রিয়া করে রাজনৈতিক চোরাগুপ্তি। দার্শনিকতার দিক থেকে রাজা আত্মতত্ত্বেরই দ্যোতক। 'রাজার বাড়ি' কবিতায় দেখা যায়-

> "আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো! / সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত। ... আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে-/ ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে সেইখানে।।"[৮]

'জীবনস্মৃতি'তে যেখানে রাজার বাড়ির অন্বেষণ, এখানে তার সন্ধান। রাজা আছে তুলসীতলায় অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরে। সহজিয়া বাউল ভাবনায় গৃহ দেহেরই প্রতীক। তাই রাজা নিজের ভিতরে অচেতনে্র অন্ধকার ঘরে। সুদর্শনা রূপী চেতন তাকে বারবার আলোয় দেখতে চায়। কিন্তু রাজা দেখা দেয় ঠিক সময় হলে, অবচেতনের দ্বার অর্গলমুক্ত করে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে রাজাকে দেখলে?

'রাজা' এবং 'রক্তকরবী' এই দু'টি নাটককে এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যাক। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা দেখি অদৃশ্য এক রাজাকে তথা রাজশক্তিকে । রাজা এবং রাজশক্তি – এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক কূটপ্রশ্ন । সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে প্রধানত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। একক রাজশক্তি থেকে অভিজাত ও সামন্ততন্ত্র হয়ে ধনতন্ত্রে পৌঁচেছে সময়। কিছু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূয়োদর্শনের মধ্য দিয়ে অবলোকন করেছেন এই সব ক'টি অবস্থান । সেকারণে বিভিন্ন ধরণের রাজার দেখা মেলে তাঁর সাহিত্যে। এটি কি তাঁর নিজস্ব শ্রেণি চরিত্রের সঙ্গে কোথাও গিয়ে এক হয়ে যায় ? যেখানে জমিদার রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ? রবীন্দ্রনাথ তো রাজার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে প্রজাদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন। রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানিয়েছেন প্রজাদের অছি হয়ে তিনি থাকতে চান। তাঁর জমিদারতন্ত্রকে প্রজামুখ্য করে তুলতে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আপ্রাণ। নিয়েছেন সমবায় নীতি। রাশিয়ার চিঠিতে বলছেন –

> "একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল – আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। ... এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে – জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত মতামতও ছিল সাধারণ মানুষকেন্দ্রিক। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে দরবার সম্পর্কিত তাঁর মতামত। দরবার প্রাচ্য প্রথা। মানুষের অভিযোগ জানাবার একটি উপায়। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ দরবারী প্রথাকে আরও প্রজা ঘনিষ্ঠ করতে চেয়েছেন উচ্চ আসন ত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে –

> "চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা-গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ... এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি।"[১০]

ফলত এদিক থেকেও বিচার্য হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাটকের রাজা চরিত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিমুখ সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। প্রাকৃতিক রাজ্য থেকে সমাজ হয়ে রাষ্ট্রে পৌঁছনোর স্তরগুলি বলাবাহুল্য রাজনৈতিক। সমাজ গঠিত হয় নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর আদানপ্রদানের মাধ্যমে, যার মূল ভিত্তি ট্যাবু ও টোটেম। এই নিরিখে গড়ে ওঠে সমাজ- সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে রাষ্ট্রে প্রধান হয়ে ওঠে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। আধুনিক রাষ্ট্রভাবনা সার্বভৌমত্ব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত। রাষ্ট্র উদ্ভবের মোটের ওপর চারটি মতবাদ পাওয়া গেছে- ঐশ্বরিক মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ। শেষ মতবাদটিই বর্তমানে অধিক গ্রহণীয়। প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের কথা আমরা জানি, সঙ্গে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। প্লেটোর মতে আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক, সৈনিক ও জনগণ এই তিন শ্রেণি থাকবে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা পশ্চিমী সভ্যতায় বিশেষভাবে দেখা যায় পনেরো শতক থেকে, যখন রোমান সাম্রাজ্য লোপ পায়, তা থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে শুরু করে, পরবর্তীকালে যা জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত।

উনিশ শতকে যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হচ্ছিল, তখন বিভিন্ন রাজ্য ও রাজাধীনে থাকা অঞ্চল যে একত্রিত হয়ে উঠছিল, সেই প্রক্রিয়াটি লক্ষণীয়। জাতীয়তাবাদ এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে তা আমরা দেখেছি। ভাষাকে কেন্দ্র করে ধর্মকে কেন্দ্র করে এই জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে পারে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সমর্থন করতে পারেননি। উগ্র জাতীয়তাবাদ আগ্রাসনের জন্ম দেয়, যেমনটা বুয়র যুদ্ধে দেখা গেছিল। 'নৈবেদ্য' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এরই প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরই ভাবশিষ্য হাল্লা মন্ত্রীর মধ্যে সেই আগ্রাসনের দিকটি ফুটিয়ে তোলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতের একত্রীকরণ কিঞ্চিৎ অভিনব, কারণ এই দেশ ভাবনা ছিল নূতন। মৎস্যপুরাণে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মর্তব্য পুরাণগুলি রচিত হয়েছে মোটামুটি গুপ্ত যুগে। গুপ্ত যুগেই অখণ্ড ভারতের একটা চেতনা সূক্ষ্মভাবে তৈরি হয় গুপ্ত সম্রাটদের রাজ্যবিজয়ের মাধ্যমে। এখানেই এসে পড়ে দেশ ও রাষ্ট্রের প্রসঙ্গ। দেশ হল চেতনা- আবেগ। রাষ্ট্র এক নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক কাঠামো। রাষ্ট্র তাই সীমানা দিয়ে চিহ্নিত। দেশ নিঃসীম। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ এই দেশেরই কথা ভেবেছেন। শুণ্ডী ও হাল্লা রাজার অন্তিম আচরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ওপর দেশ জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশও 'মিলাবে- মিলিবে', অন্তত সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তো বটেই। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমাজমুখ্যতার কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রকাঠামোয় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম (অবশ্য সামাজিক স্তরে কোনরকম সমস্যা নেই এমনটা নয়, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক আইন ব্যবহার করে মানুষকে বাঁচিয়েছে। তবু সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপারটিও অনস্বীকার্য)। রাষ্ট্র গঠনের সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব অনুযায়ী হবস রাষ্ট্র ও শাসককে এক করে দেখেছেন। এর কিছু পরে লক দুটিকে দেখেছেন। ভারতীয় স্মার্ত মনু রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধির ন্যায় গণ্য করলেও অত্যাচারী ও অকর্মণ্য শাসককে পদচ্যুত করার অধিকার প্রজাদের দিয়েছেন। পাশ্চাত্যে রুশোর মতে মানুষ সর্বদা স্বাধীন; কিন্তু সার্বিক মঙ্গলের জন্য নিজেকে আবদ্ধ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ইত্যাদিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত বলে তিনি মনে করেছেন। রুশোর প্রভাব ফরাসি বিপ্লবে অনস্বীকার্য। রোমান্টিক বিপ্লবে এখান থেকেই আসে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ মোটের ওপর রোমান্টিক। সেই রেনেসাঁ ও তৎপরবর্তী বুর্জোয়া উত্থানের সঙ্গে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হচ্ছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে কেউ কেউ মিলিয়ে দেখতে চান। কিন্তু ভারতের ব্যক্তি বৈচিত্র্য ও স্ব-পূর্ণতার আদর্শের কথাও মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে। এই অভিমুখ বা দৃষ্টিকোণ থেকে স্মৃতি ও সত্তায় সমাজমুখ্যতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্র প্রাধান্য অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে এক দ্বান্দ্বিকতা দান করেছে। এখান থেকেই প্রশ্ন উঠতে পারে জমিদার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভাব সম্পর্কিত, অর্থাৎ প্রজা মুখ্য ব্যবস্থায় রাজার প্রয়োজনীয়তা কোথায়! প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সমাজের প্রতিভূ তা দাঁড়িয়ে আছে আধা সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক নব্যধনতন্ত্রের এক অসমঞ্জস অবস্থানের ওপর। সেই অবস্থান থেকে তিনি যখন অন্যান্য দেশের সামাজিক পরিস্থিতি ও শাসনপদ্ধতি দেখেন, তখন ভোলেন না নিজের দেশের বাস্তবতা। রাষ্ট্রের সর্বময়তার নিদর্শন তখন সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে, ব্রিটিশ শাসনে। এবং সেই রানি বা রাজা দেশ শাসন করে সমুদ্রের ওপার থেকে। সাধারণ মানুষের কাছে সেটি অদৃশ্যই। এখন এই অদৃশ্যময়তা দুইভাবে প্রতিভাত হতে পারে। এক, রাজার আলাদা অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। প্রজার সেখানে স্বচ্ছন্দবিহার। রাজা নাটকে 'আমরা সবাই রাজা' গানটির মধ্যে তাই হয়ত গণতন্ত্রের বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন টমসন। রাজা যেহেতু আমরা নিজেরাই, সুতরাং রাজা অর্থে এখানে স্বাধীনতা। স্ব + অধীনতা। মনে রাখতে হবে জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ছিল স্বনির্ভরতা, রবীন্দ্রনাথের কাছে। বিষয়টিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে ফ্রয়েডীয় প্রতীক তত্ত্ব অনুযায়ী রাজা, শাসক, আরক্ষা পিতৃ প্রতীক, যা নিয়ন্ত্রণের দ্যোতক। স্বনিয়ন্ত্রণে থাকা মানুষই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এভাবেই সুশীল সমাজের জন্ম হয়, যেখানে স্বেচ্ছায় মানুষ যোগদান করবে। এখানে রুশোর মুক্ত- ইচ্ছার কথা উল্লেখ্য। অন্যদিকে এমন রাজা, যিনি জালের আড়াল থেকে লক্ষ রাখেন অগোচরে। এটাই আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নজর রাখার পদ্ধতি। ফুঁকোর পরিভাষা ধার করে বলা যেতে পারে 'Panopticism'.

> "Inspection functions ceaselessly. The gaze is alert everywhere: 'A considerable body of militia, commanded by good officers and men of substance' guards at the gates, at the town hall and in every quarter to ensure the prompt obedience of the most absolute authority of the

> magistrates … on the whole, therefore, one can speak of the formation of a disciplinary society in this movement that stretches from the enclosed disciplines, a sort of social 'quarantine', to an indefinitely generalizable mechanism of 'panopticism' … Our society is one not of spectacle, but of surveillance…"[১১]

রাজা এবং মকররাজের এই তফাৎটুকুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন নবনীতা দেবসেন তাঁর প্রবন্ধে –

> "প্রকৃতপক্ষে এই দুই চরিত্রের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। মকরের দাঁত যে ব্যক্তির প্রতীক, তার সঙ্গে পদ্মের মর্মস্থলে বজ্রধারী রাজাটির কিসের মিল? মকররাজ একজন সাধারণ মানুষ যিনি নিজেকে জাহির করতে চান অতিমানবিক রহস্যময় পুরুষ হিসেবে, আর 'রাজা' সত্যিই এক রহস্যময় শক্তিমান পুরুষ, যিনি নিজেকে মানবিক মমতায় জড়াতে চান।"[১২]

এখানে ব্যক্তি রাজাকেই পরিগণিত করা হয়েছে। নিরাকার বিমূর্ত রাষ্ট্রশাসনের প্রতীক যে ব্যক্তি। আবার তা সমাজ হলে সমাজপতি। প্রাক – সভ্যতার কালে সেটি দলপতি। আপাতভাবে সাধারণ মানুষের মন এক নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। রাজা এক্ষেত্রে সেই আশ্রয়। এমনকি সেকারণে নিজের ভিতরের মর্ষকামিতাকে জাগিয়ে তুলতেও উদগ্রীব। সেহেতুই পদ্মের মধ্যে বজ্র। কঠিন – কোমলে মেশা ব্যক্তিস্তরিক ধারণা থেকে রাষ্ট্রশাসক ভাবনার যে ক্রম তা লুকিয়ে আছে একধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভবে। সেকারণেই একসময় প্রজারা বলে– "আমাদের দেশে রাজা একজায়গায় দেখা দেয় না", আবার "আদপে রাজা নেই এ রাজ্যে"– দুইই। এই দোলাচলতায় দিশাহারা হয়ে পড়ে প্রজাদের জীবন। তাদের অনুভবের বাইরে থাকে উপলব্ধির সেই স্তর যে, প্রজারাই রাজশক্তির চালক। অন্যদিকে প্রজাদের সমস্ত আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে 'মরা ধনের' কারবারি মকররাজের রাজরথ। জালে ঘেরা আড়ালে সে বন্দি থেকেও প্রতাপে অদ্বিতীয়। রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন –

> "অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণকরা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটা হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্স।"[১৩]

এই তথাকথিত অশক্তের, 'সভ্যতার পিলসুজের' ওপর ভর করেই তো শক্তিমানের শক্তি প্রদর্শন! 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী এবং অধ্যাপকের কথোপকথনে বিষয়টি ফুটে ওঠে–

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অবশ্য 'রক্তকরবী' নাটকে জালের আড়াল প্রায় সর্বত্রসঞ্চারী হয়েও একটু ফাঁক থেকে যায়। সেখানেই আবির্ভাব ঘটে সর্দার চরিত্রের। রাজা সেখানে নিজেই হয়ে পড়ে আক্ষরিক অর্থেই জালে বন্দী।

এর পাশাপাশি আমরা সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' এবং 'হীরক রাজার দেশে' ছবি দুটিকে দেখে নিতে পারি। আপাত রূপকথাধর্মী কথার (tale) অভ্যন্তরে রজনৈতিক চলন এই ছবি দুটির বৈশিষ্ট্য। 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা একটি গল্প। সত্যজিৎ রায় যখন ছবিটি তৈরি করেন তখন তা হয়ে দাঁড়ায় গল্পটির এক ভিন্নতর ব্যাখ্যা তথা উদ্ভাসন (interpretation)। উপেন্দ্রকিশোর থেকে সত্যজিৎ এই তিন প্রজন্মের সময়ের রাজনীতির ধরণ গেছে বদলে স্বাভাবিকভাবেই। গল্পের শুণ্ডি ও হাল্লা রাজা এবং চলচ্চিত্রের হাল্লা ও শুণ্ডি রাজার স্বভাব তাই গেছে পাল্টে, স্বভাবতই। এর মধ্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে সুকুমার রায়ের 'রাজার অসুখ' গল্পটি। সেখানে রাজা ও ফকিরের অবস্থান, আনন্দ ও মুক্তির এবং বদ্ধতার দ্বন্দ্ব। দুখী রাজা তাই মাঠে খোলা

হাওয়া খেলে শান্তি পায়, গুপীর গানে। ঠিক এখানেই নজর পড়ে 'শারদোৎসব' নাটকটির দিকে, এবং সেই সূত্র ধরে 'ঋণশোধ' নাটক। 'ঋণশোধ' নাটকের ভূমিকাংশে লক্ষ করা যায় –

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করার দায়ও তো ততই বাড়বে– তাহলে থামবে কোথায় ?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিয়ে যায়।

এই আগ্রাসী লোভই দেখা যায় হাল্লার মন্ত্রীর মধ্যে। রাজ্যের লোককে আধপেটা খেতে দিয়ে, না দিয়ে সেই সঞ্চিত (বলা ভালো লুণ্ঠিত) অর্থে চলে সৈন্যের কুচকাওয়াজ । খিদের কথা বললেই প্রজাদের শুনতে হয় আজ বাদে কাল যুদ্ধের কথা। ধনঞ্জয় বৈরাগীর উদ্বৃত অন্ন এবং ক্ষুধার অন্নকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে শাসনের নামে শোষণ। রাজা আপন জালে বন্দী। 'রক্তকরবী' নাটকেও দেখা যায় সর্দারই হর্তাকর্তা। এই বিষয়ে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমলার মন' গ্রন্থের রক্তকরবী বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি দেখাচ্ছেন রক্তকরবী একইসঙ্গে ডমিন্যান্স এবং হেজিমনির আখ্যান । তা ছিল বিদায়ী ব্রিটিশ শক্তি ও গণতন্ত্রের উত্থানপূর্বের রূপরেখা। এদিক থেকে সত্যজিৎ যখন 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' নির্মাণ করেন, তখন স্বাধীন ভারতে মন্ত্রীদের কার্যকলাপ কি লক্ষ্য বস্তু হয়ে ওঠে ? রাজা কি দেশের রূপক? দুই রাজা প্রতিবেশী দুই দেশের রূপক। কৌটিল্যের চক্রবর্তী রাজার ভাবনা এখন প্রায় অস্তমিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালে। মন্ত্রী চালিত দেশের স্থিতি ও অস্থিরতা এক বিমূর্ত উদ্বেগের জন্ম দেয়। সুকুমার রায়ের 'কানা-খোঁড়া সংবাদ'– এর সেই দুই রাজা

"মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পর ধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাট বিকট অতি ।
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি
মেজাজ রাজারি মত,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত ।
ভাই ভাই মত ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি, ..."[১৪]

এই সৌভাতৃত্ব ভেঙে যেতে থাকে তিন হাত জমির জন্য। পৃথিবীর আদিমতম লিপ্সা ভূমি দখল এবং তৎসংলগ্ন মানুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার। ডমিন্যান্স থেকে হেজিমনি। এভাবেই এক জৈব ও মানস ক্ষমতাকে সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে সময়ের সঙ্গে সেই অবস্থাকেই মনে হয় স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে এটিই 'মগজধোলাই'। যেখানে মানুষ হয়ে ওঠে যান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ছিল একদল পুতুল। শাসকের অঙ্গুলিহেলনে নেচে উঠত। আধুনিক নব্য-ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ এখন রোবট। এভাবেই রাষ্ট্রের আড়ালে শাসকের জৈব-মানস আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে কেমন হতে পারে আদর্শ রাষ্ট্র ও শাসকের প্রতিচ্ছবি ? গ্রামশ্চি বলছেন,

> "In my opinion, the most reasonable and concrete thing that can be said about the ethical state, the cultural state, is this: every state is ethical in as much as one of its most important functions is to raise the grate mass of the population to a particular cultural and moral level, a level (or type) which corresponds to the needs of the productive forces for development, ..."[১৫]

যদিও সাংস্কৃতিক আধিপত্য, এর মাধ্যমে স্থাপিত হয় কি না, তা বিচার্য। কিন্তু তবু, যে রাজার রাজ্যে বসে সঙ্গীতের আসর, পাখিদের কলকাকলি আর অন্য দিকে সৈন্যের কুচকাওয়াজ সেখানে দুটির মধ্যে পার্থক্য অবিদিত নয়। এর সাহায্যেই অনুধাবন করা যায় রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিতের আদর্শ দেশ সম্পর্কে মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' নাটকে শরতের যে বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়, যেখানে শরৎ দিগ্বিজয়ের ঋতু- প্রাচীন রাজা যুদ্ধ জয়ে বের হতেন। বণিকরা বের হত বাণিজ্যে। যাত্রার রূপকেই আসে 'অমল ধবল পালে' বেয়ে মেঘের গমন। শরৎ তাই অবকাশ, সোনালি রৌদ্র। একদিকে যেমন লক্ষেশ্বর ব্যবসা বুদ্ধি ও অন্যদিকে রাজা বিজয়াদিত্যের দিগ্বিজয়। কিন্তু এই বিজয় প্রকৃতির বিজয়ের ন্যায়। সেখানেই সংঘাত বাঁধে অঙ্গরাজ্যের রাজার সঙ্গে।

রাজা। সেকথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু!

সন্ন্যাসী। তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা। পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজার ছদ্মবেশে বিজয়াদিত্য প্রকৃতই রাজর্ষি, যার আকর্ষণ-সীতা উৎসবের বনভোজনে যাওয়ার জন্য প্রাণ কাঁদে। এখানেই তুল্য হয়ে ওঠে ছবির হাল্লা রাজা। কিন্তু বিজ্ঞান ও যাদুকে কাজে লাগিয়ে তাকে করে তোলা হতে থাকে হিংস্র রোবট। পাশব প্রবৃত্তিকে করা হয় লাগামছাড়া। নব্য সমাজ এভাবেই আমাদের লোভাতুর করে অপ্রাপ্তির হতাশায় তলিয়ে দিয়ে আগ্রাসী করে ফেলছে তার বৈজ্ঞানিক পণ্যের সহায়তায় এবং মুক্ত ক্রয় বিক্রয়ে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' গল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্য প্রসঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোরের গুপী ও বাঘার কাহিনি প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও ইচ্ছাপূরণের গল্প। কাইন (গাইন) এবং পাইন (বাইন) নিম্নবর্ণীয়, তদুপরি নিজেদের শখের কারণে তারা প্রান্তিক। ভূতের রাজার বরে শুরু হয় পট পরিবর্তন। গল্পে তিন বরের মধ্যে প্রথমে গুপী ও বাঘা চায় গানবাজনার অধিকার ; কিন্তু চলচ্চিত্রে প্রথমে খাওয়া পরার কথা আসে, যেটি গল্পে ছিল দ্বিতীয় বর, এখানে গানবাজনার অধিকার তাদের পরিচয়ের সঙ্গে জড়িত। তাদের অস্তিত্ব। সত্যজিৎ তিন বরের প্রসঙ্গটির বিন্যাস করেন মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকারের ক্রমঃস্তরে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। যোগাযোগ-ভ্রমণ, শখ ও আনন্দ। শুধু এখানে বাসস্থানের উল্লেখ নেই, তাদের ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে, গাছের ছায়ায় তাদের দিন কাটে। নদীর পাড়ে মহাভোজে বসে যায়। Abraham Maslow নামক এক মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ববিদ মানুষের মৌল চাহিদার এক পিরামিডের ন্যায় রেখাচিত্র পরিবেশন করেছিলেন, যার পাঁচটি স্তর।[১৬] ground level- Basic/ psychological needs, safety & Security, Love & Belongings, Self-esteem, Self-actualization.

. Psychological needs (breathing, food, water, shelter, cloth, rest)

. Belongings and Loveliness (love affection, friendship) - Esteem needs

. Self- actualization (creative activities) - Self-fulfillment.

এই দিক থেকে প্রাথমিকভাবে খাদ্য, বস্ত্রের কথা এসেছে। তবে ভূতের রাজার বরের পর প্রথম দিনের আলোয় গলা ছেড়ে ওঠে গান, তারপরই অনুভূত হয় 'পেটে খালি বড় ভুখ'। এখানে ওই পিরামিড চিত্রের অবরোহণ ঘটেছে। ঠিক এরপরই আসে মধ্যবর্তী পর্ব (Belongingness), যেখানে রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যার কথা মনে আসে।

অন্যদিকে ভূতের নাচের সেই দীর্ঘ দৃশ্য। 'দর্পণ' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ এই ব্যাপারে বলেছেন চেনাভূতকে ছেড়ে বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকেই তিনি জানতে চেয়েছেন। ভূত অর্থাৎ অতীত হলে, অতীত থেকেই চলে আসা সমাজের বর্গ ও বর্ণের ক্রমবিন্যাস ধরা যেতে পারে। রাজা-রাজাড়া, চাষাভুষো, সাহেব ভূত, মোটা বেনে ভূত এইভাবে স্তর বিন্যাস হয়। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। লক্ষণীয় গুপী-বাঘাকে বর দেয় ব্রাহ্মণ ভূত (ব্রহ্মদৈত্য), অর্থাৎ এই তিনস্তরের মাথা, যার অনুমোদনের ওপরই ওই প্রান্তিক গুপী ও বাঘার অস্তিত্ব টিকে আছে। এই বিন্যাস মৃত্যুর পরেও যেন মানুষের পিছু ছাড়ে না। অন্যদিকে সাহেব ভূত বাইবেল হাতে প্রবেশ করে, এরপর সামাজিক চিত্র একটু পরিবর্তিত হয়, অন্তত উৎপাদন ব্যবস্থার দিক থেকে। এবং ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় ক্ষুধা হয়ে ওঠে অন্যতম লক্ষণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এই নেটিভদের খিদের একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ

বিশ্বস্ত দলিল পাওয়া যায়। পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবিই 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎও প্রত্যক্ষ করেছেন মন্বন্তর ও স্বাধীনতা পরবর্তী খাদ্য আন্দোলন।

তিনটে বর যেন সব পেয়েছি দেশের সন্ধান। যেখানে খাওয়া পরার অভাব নেই, তালি দিলেই চলে আসে। যেখানে মনের আনন্দে গেয়ে ওঠা যায়। আবার গানই হয়ে ওঠে অস্ত্র। যার দ্বারা যুদ্ধ থামানো যায়। আবার জীর্ণ জীবনহারা যাপনের নির্মোক আত্মাকে অনাবিল করে সঙ্গীত। তাই হাল্লা রাজার রাজসাজ খসে পড়ে গান শুনলে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে বলা হয়েছিল গানে শত্রুকে মিত্র করা যায়।

সঙ্গীত-অস্ত্রের এক ভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায় 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে। এখানে যুদ্ধ হয়েছিল, অত্যাচারী শাসকের পতনের লক্ষ্যে। কিন্তু সেই যুদ্ধ বা বিপ্লব অহিংস, রক্তপাতহীন। এক গণতান্ত্রিক কাঠামোর ছাঁদ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে শেষে অপামর সর্বশ্রেণি ও সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয় রাজমূর্তি ভাঙনকল্পে। যেন 'রথের রশি' নাটকের উচ্চনীচ ভেদ সমান করে, মহাকালের রথ যাত্রা। এই গণতান্ত্রিক ভাব লক্ষ করা যায় 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবিতেও, যেখানে মূক প্রজাদের বাকক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ নীরব, অনুচ্চ কণ্ঠস্বরও স্বীকৃতি লাভ করে। এবং দুই রাজার পরিচ্ছদ হিন্দু ও মুসলমানের। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্র। 'রক্তকরবীর'র শেষে রাজা নিজের বিরুদ্ধেই লড়তে যায়, বুঝতে পারে নিজেই নিজের তৈরি তন্ত্র (system) –এর শিকার। 'হীরক রাজার দেশে' ও রাজার নিজেরই মগজধোলাই হয়ে যায়। 'রক্তকরবী'র সর্দারতন্ত্রের ছাপ লক্ষ করা যায় 'গুপীগাইন ও বাঘাবাইন' ছবির হাল্লার মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে। 'হীরক রাজার দেশে'-তে রাজা স্বৈরাচারী (autocrat), অনেকটা মকররাজের মতনই। ধরিত্রীর বুক চিরে সোনা এবং হীরা তারা বের করে এনে, তাকে কুক্ষিগত করে এক অশোভন ঐশ্বর্যের প্রদর্শন করে তারা। 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> "... 'পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে। তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্ । অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল । হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রুকুটির সামনে বসে থাকতেন আর মনে মনে বলতেন, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর- অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই।"[১৭]

এবং সংগ্রাহক প্রবৃত্তি থেকে সঞ্চয়ীবৃত্তি যান্ত্রিকতার সূচনা করে। এই যন্ত্র ও প্রাণই কুবের ও লক্ষ্মীর প্রতীক। মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে মানুষকে এই যান্ত্রিক করে তোলারই প্রচেষ্টা চলে। যান্ত্রিক অর্থে নিজস্ব অনুভূতি, আবেগ, চিন্তন শক্তি তিরোহিত। সেখানেই আঘাত হানে গুপী ও বাঘা। যখন হীরক রাজার বিরুদ্ধে গুপী গান গেয়ে ওঠে, তখন সেই গানের প্রথম কলিই হয় "নহি যন্ত্র নহি যন্ত্র আমি প্রাণী।" যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী'তে। যান্ত্রিকতার চরম এক রূপ দেখা যায় 'মুক্তধারা' নাটকে। সেখানেও যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই। তবে লড়াইটা ঠিক যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রের আড়ালে রাষ্ট্রের আগ্রাসনকে অনেক সময় আমরা লক্ষ করি না। কিন্তু 'মুক্তধারা'য় এমন এক Totalitarian রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সবই হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের অনুকূল । শিক্ষক, বিজ্ঞানীর পরিচয় রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারী মাত্র । মার্কসের মতে,

> "The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage-labourers." [১৮]

আধুনিক সংগ্রহপ্রবণ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটিই ভবিতব্য। এখানেই গোল বাধায় গুপী ও বাঘা। যক্ষপুরীতে যেমন নন্দিনী। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায়– *ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎ বজ্রধারী দেবতার আপন প্রাসাদাদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত।*

কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

গুপী ও বাঘা দু'জনে এসে এক বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চকিতে মনে পড়ে যেতে পারে 'তাসের দেশ' নাটিকার কথা। 'তাসের দেশ' নাটিকাতে রূপকথার ন্যায় অভাব-যাত্রা-আরোপণ-প্রতিপক্ষ এই ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অভাব, জীবনীশক্তির অভাব। গুপী বাঘার ক্ষেত্রেও তাই, একঘেয়ে দিনযাপন থেকে ভ্রমণ। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে যায় হীরক রাজ্যে। সেখানে এক গুহায় পরিচয় ঘটে উদয়ন পণ্ডিতের সঙ্গে। 'তাসের দেশ'-এ নিয়মের রাজত্বে ফাটল ধরায় রাজপুত্র- সদাগর পুত্রের জুড়ি। নিয়মের রাজত্বে এক অর্থে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ফ্যাসিস্ট শাসকরা মূলত অতিরিক্তমাত্রায় আত্মপ্রেমী। চলচ্চিত্রে গুপী ও বাঘা সরাসরি বিপ্লব আনেনি কিন্তু অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। এখানে একটা পার্থক্য ঘটেছে 'তাসের দেশ' -এর সঙ্গে এবং 'মুক্তধারা'র সঙ্গেও। 'মুক্তধারা'য় শিক্ষককেও রাষ্ট্র করে তুলতে পেরেছে অনুরাগী। 'হীরক রাজার দেশে' ঠিক তার পূর্ব পর্যায়, হীরক রাজার সৈন্য হন্যে হয়ে খুঁজেছে উদয়ন পণ্ডিতকে। যাবতীয় পুঁথি পত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। সংস্কারের নামে ঐতিহ্যকে ধ্বংস একাধিকবার দেখা গেছে ইতিহাসে। শিক্ষাকে ধ্বংস করে এবার খোঁজ চলছে উদয়নের, মগজধোলাইয়ের জন্য। যদিও সেই মস্তিষ্ক প্রক্ষালোক যন্ত্র শেষে রাজার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় । এখানেই গুপী-বাঘার ভূমিকা। উদয়ন, সেই বুদ্ধিজীবি শ্রেণির, বিদেশি শক্তির সাহায্যে বিপ্লব ঘটাতে চায়। অন্যদিকে বিজ্ঞানী, মস্তিষ্ক প্রক্ষালক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। রাষ্ট্র তার উদ্ভাবনী শক্তিকে এভাবেই নিজের কাজে লাগিয়েছে। সেও সেবকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে হতাশাকে লুকোতে পারেনি, বিশেষ করে যখন সে 'আমি একা, আমি একক, একমেবদ্বিতীয়ম' বলে তখন সেই যন্ত্রণা ও রাগ ফুটে ওঠে। গুপী ও বাঘা এটাকেই কাজে লাগায়, যদিও তার মধ্যে লোভ জাগিয়ে তুলে। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখলে, এটি সম্পদের বন্টন, যখন সঞ্চিত হীরক, গুপী ও বাঘা বিলিয়ে দেয় জনসাধারণের মাঝে। দ্বিতীয় বিরোধী কণ্ঠের চারণগান শোনা যায় ঠিক এই সংলগ্নেই। অনেকটা রবীন্দ্রনাট্যের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো। এবার ভাঙতে থাকে রাজতন্ত্র। যদিও রাজতন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে। প্রকৃতদৃষ্টিতে যে কোন শাসকতন্ত্র। অনেকসময় গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে, বিপ্লবের আড়ালে আসে একনায়কতন্ত্র (Jacob Leib Talmon প্রদত্ত Totalitarian democracy-এর ভাবনা প্রসঙ্গত স্মরণীয়) চলচ্চিত্রেও আমরা হীরক রাজাকে একাধিবার দেখি মন্ত্রীদের 'ঠিক কি না' জিজ্ঞাসা করতে, মন্ত্রীদেরও যেন কাজ শুধু 'ঠিক' কথাটা উচ্চারণ করা। শুধু পুরোহিত-জ্যোতিষী মাঝেমধ্যে ঈঙ্গিতপূর্ণ রহস্যময় কিছু উক্তি করেন। তা বাদে কবিও বেতনভুক কর্মচার। তার কবিত্বশক্তি হীরকরাজার গুণকীর্তনেই নিবেদিত। তাহলে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির উন্নতিকামী গণতন্ত্রের অবস্থান কি এখানে ধাক্কা খেল? কিন্তু এর পাশেই দেখা যায় ছবির শেষে জনসাধারণের জাগরণ। যাদের জীবন ছিল গদ্যময়, ক্ষুধার রাজ্যে। এর সঙ্গে মিলিত হয় কাব্যের রাজ্যের রাজা ও রাজপ্রতিনিধি। রাজাও মুক্তি পায় তার রাজত্বের শৃঙ্খলাবয়ব থেকে। যেমন হাল্লার রাজা শরতের আকাশের মতোই ছুটির আনন্দে ছুটে বেড়ায়। এই মুক্তিই প্রাণ। স্বতঃস্ফূর্ততা। জীবন।

> "স্বভাবতই সংসারের একটা দিক যান্ত্রিক। সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতিক কাঠামো, রাষ্ট্রিক কাঠামো, সবই অল্পবিস্তর যান্ত্রিক... কঙ্কালের নীরস অথচ দৃঢ় কাঠামোটাকে বাদ দিলে মানবদেহের চলে না। কিন্তু কঙ্কালের কাঠামোটাই সব নয়, তার উপরে রক্তমাংস আছে, এবং সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে দেহের লাবণ্য ও মুখশ্রী। ঐখানেই মানুষের পরিচয় ... যন্ত্র এবং প্রাণ, দার্ঢ্য ও প্রেম, কর্তব্য ও আনন্দ মিলাইয়া জীবনের পূর্ণতা। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সমাজে যদি যন্ত্রের দিকটাই প্রবল হইয়া ওঠে, তখন সে সমাজ মরিতে বসে। তখন সেই সমাজের মধ্যে হয় নন্দিনীর আবির্ভাব ঘটে, নয় সেই সমাজ ধ্বংস হয়।"[১৯]

গুপী বাঘা ফিরে এলো' এ থেকে একটু ভিন্ন। এখানে গুপী ও বাঘার আকাঙ্ক্ষা এবং আচার্য্যি মশাইয়ের অভীপ্সা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ছবির প্রথমেই গুপী ও বাঘার মনোদুঃখ লক্ষ করা যায় বয়োবৃদ্ধির কারণে। 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রথমে দেখা যায় রাজার বয়সবৃদ্ধি হেতু হতাশা। কবিশেখর বলে- *মহারাজ, এ-যৌবন ম্লান যদি*

হল তো হোক-না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন – নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে। সেখান থেকেই শুরু নাট্যকাহিনির বুনন। শেষ অবধি সেটি পৌঁছে যায় জীবন-মৃত্যুর দার্শনিকতায়। ফাল্গুনীর রাজাও আত্মপ্রেমী। রাজ্যের কর্ম, আশু কর্তব্য ফেলে রেখে, নিজের বয়সের চিন্তায় বিভোর। কিন্তু কবিশেখর ফাল্গুনী নাটকের মধ্য দিয়েই রাজার চক্ষু উন্মোচন করতে চায়। নাটকের প্রেক্ষিতে বসন্তকাল। কারণ বসন্ত শুধু ফোটো ফুলের মেলা নয়, ঝরা পাতার খেলাও। এই দ্বিতীয় যৌবনেই সম্ভব হয় নিরাসক্ত ভোগ। ত্যাগ ও ভোগের সঙ্গম। *এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত। আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।* [ফাল্গুনী]

গুপী ও বাঘাও এই সহজ এবং অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পায় এক স্বপ্নের মাধ্যমে। ভূতের রাজা আক্ষেপ করে, গুপী বাঘার এই পতনে। পরদিন প্রথম সকালে, আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে আলোর কাছে, সত্যের কাছে, সহজের কাছে। সেই পথ দিয়েই আচার্যি্য মশাইয়ের বিনাশ ঘটে। আচার্যি্য চেয়েছিল অমরত্ব। এই অভীপ্সা বাড়িয়ে তুলেছিল শুধু ভোগ লিপ্সা। মৃত্যুভয় থেকেই জাগে অবিরাম ভোগের তাড়না। ক্লান্ত মন ছুটে চলে নতুন ভোগের সন্ধানে। এই সত্য অস্বীকারের ভ্রমকে ছেদ করার জন্য প্রয়োজন এক নিষ্পাপ অন্তর্ভেদী চোখ। সেই ভূমিকাই পালন করে বিক্রম। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এক বালিকা সন্ন্যাসীর নব সত্তার উদ্বোধন করে। বিক্রম এখানে দুর্গে বসবাসকারী সন্ন্যাসীরূপী দৈত্যের বিনাশ করে। গুপী ও বাঘার গান আর সরাসরি অস্ত্র না হয়ে এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সঙ্গত। এখানেও যুদ্ধ হয় রক্তপাতহীন। নিষ্পাপ দৃষ্টি। বিবেকের দৃষ্টি। চেতনার। গান সেই চেতনাকে চৈতন্যময় করে তুলতেই সাহায্য করে। 'আগন্তুক' ছবিতে সত্যজিতের আত্ম-মানসচরিত্র বলে তারাই সভ্য যারা অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তারই বিরোধী এক রূপ ফুটে ওঠে এই রক্তহীন যুদ্ধ বা বিপ্লবে।

> "Derrida insists that deconstruction is not a method, technique or species of critique. According to Derrida, deconstruction is a useful means of saying new things about the text."[২০]

এই নতুন দিককেই দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। রবীন্দ্রনাটক এবং উপেন্দ্রকিশোর- সুকুমারের সাহিত্যের এক ভিন্ন আঙ্গিকীকরণ ঘটেছে চলচ্চিত্রে। সঙ্গে মিশেছে সেই সময়ের দান। তাঁর নিজস্ব দূরদর্শিতা, বিশেষত রাজনৈতিক বোধ। যেমন, উৎপল দত্ত একটি লেখায় (বিদ্রোহী সত্যজিৎ) হীরক রাজার হাস্যকর ভাবে উপস্থাপনাকে তুলনা করেছেন মাও সে তুং -এর 'কাগুজে বাঘ'-এর সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে এভাবে বয়ে চলে ঐতিহ্য পরম্পরা। প্রবহমানতা সংস্কৃতির লক্ষণ। প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলছেন,

> "যিনি উপেন্দ্রকিশোরের নাতি ও সুকুমার তনয় তিনি যে রবীন্দ্রনাথকেই গৃহদেবতা ভাববেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু সবিস্ময়ে খেয়াল করি তিনি রবীন্দ্রনাথকে কত ভাবেই না আবিষ্কার করেছে।"[২১]

এবং দুজনের দর্শনই কোথাও গিয়ে মিলে গেছে মানবতাবাদী এক বাঁকে। যদিও আভিধানিক মানবতাবাদে দুজনের কেউই চিহ্নিত হতে চাইতেন কি না সন্দেহ। সত্যজিৎ তো আলাদা করে মানবতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কোথায় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঠিকই তো, শিল্পী মাত্রেই মানবতাবাদী। সমস্ত তন্ত্রই মানবসৃষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ যে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার কথা ভাবতেন, সেখানে সত্যজিৎ হয়ত একমত হবেন না; কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের হেরফের হয় না। রবীন্দ্রনাথও মানুষের পার্থিব চাহিদাকে অস্বীকার করেননি, এমনকি রাজনৈতিকতাকে দেখেছেন মানুষের সার্বিকতার দিক থেকে। 'বর্ষামঙ্গল'-এর শান্তিবচনে তাই ডাক দেন দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য। 'হীরক রাজার দেশে'ও উদয়ন পণ্ডিত বলে যুদ্ধটা প্রয়োজন। সামগ্রিক স্বার্থে যুদ্ধ কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' এর পাশাপাশি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিরোধী ছবির মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক ছবির প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রাজনৈতিক হিসেবে আলাদা ভাবে চিহ্নিতকরণে তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না। আবার এও বলেছেন ভারতে সরাসরি রাজনৈতিক ছবি করা সম্ভব নয়। সত্যজিৎ ছবির আঙিনায় রাজনীতিকে এনেছেন প্রত্যক্ষ ও প্রতীকী দু'ভাবেই। আমরা 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'কে সত্যজিতের প্রথম সার্বিক রাজনৈতিক ছবি বলতে চাই। এর আগের ছবিগুলি যে অরাজনৈতিক তা নয়, পুনরুক্তি সত্ত্বেও বলতে হয় সব শিল্পই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক। বিশেষ

করে 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'মহানগর' প্রভৃতি ছবি উল্লেখ্য। কিন্তু গুপী বাঘায় আমরা সরাসরি দেশের অবস্থান, সৌভাতৃত্ব, রাষ্ট্রের আগ্রাসন, নিম্নবর্ণের অবস্থান লক্ষ করি। এর পরেই 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র মধ্য দিয়ে কলকাতা ত্রয়ী হয়ে 'হীরক রাজার দেশে' পৌঁছনো। এই ছবিটিকে সত্যজিৎ ফান্টাসিধর্মী বলেছেন। কিন্তু আবারও রূপকের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বার্তা। এভাবেই মানুষের সামগ্রিকতা ও জাতীয়তার শিকড়ে আন্তর্জাতিকতায় শাখা মেলেছেন দুজনেই। জীবনপ্রান্তে এসে সমগ্র সভ্যতা ও জীবনের পাদটীকা নির্মাণ করেন 'সভ্যতার সংকট' এবং 'আগন্তুক'-এর মাধ্যমে। 'সভ্যতার সংকট' -এর শেষের সেই আশাবাণীই হয়ে ওঠে উভয়ের জীবনের কস্তুরি মৃগনাভি।

> "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ বলে যাব, প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে..." [২২]

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জী:

১। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, শঙ্খ ঘোষ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০০৯, পৃঃ - ৩১।
২। প্রবন্ধ সংগ্রহ, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, ২০১৫, পৃঃ - ৩০৮।
৩। অপুর পাঁচালি, তদেব, ২০১৮, পৃঃ - ১৮।
৪। তদেব।
৫। উপেন্দ্রকিশোর, সত্যজিৎ রায়, প্রবন্ধ সংগ্রহ (মূল গ্রন্থ), প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৪০৭-৪০৮।
৬। রূপকথা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (মূল গ্রন্থ), সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা-৭৩, চৈত্র ১৩৫৩, পৃঃ- ৩-৪।
৭। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা - ১৭, ১৪২৬, পৃঃ- ১৯।
৮। রাজার বাড়ি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশু (মূল গ্রন্থ), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৬, পৃঃ- ৫৫।
৯। রাশিয়ার চিঠি, তদেব, ১৪১১, পৃঃ - ২৫-২৬।
১০। কালান্তর, তদেব, ১৪২৫, পৃঃ - ৩৪৪।
১১। Discipline and punish – The Birth of the Prison, Michel Foucault, penguin Book, England, 1991, P – 195-217 .
১২। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, নবনীতা সেন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১৩৯০, পৃঃ- ৫০।
১৩। রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ - ২১।
১৪। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র (প্রথম খণ্ড), সুকুমার রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ-১২০।
১৫। Prison Notebooks, Antonio Gramsci, Fleek Books, London, 1999, P-526 .
১৬। ১৯৪৩ সালে 'Psychological Review' journalএ প্রকাশিত 'A Theory of Human Motivation' শিরোনামে। বর্তমান তথ্য আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত- [https:// canadacollege.edu, access date-30.4.25]
১৭। কালান্তর, পৃঃ - ১৭৩।
১৮। The Communist Mannifesto, Karl Marx & Friedrich Engels, Vintang Book-Penguin Random House, New York, 2018, P. – 26।
১৯। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, - ৭৩, ১৯৯৮, পৃঃ-২৫৯।
২০। আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত, Gavin P. Hendricks, http://www.scielo.org.za
২১। অনভিজাতদের জন্য অপেরা, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রতিভাস, কলকাতা - ২, ২০১৪, পৃঃ - ৫২।
২২। কালান্তর, পৃঃ - ৪১৬।

মূল ও আকর:

মূল রবীন্দ্রনাটকের জন্য –
১। রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলকাতা – ১, শিক্ষাসচিব-মহাকরণ, ১৯৮৪।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), তদেব, ১৯৮৫ ।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের জন্য –

(i) Tech 3.0 with Dutta vlogs (youtube channel)
(ii) Tulika films (Ibid)
(iii) Mukta Akash Bangla (Ibib).

সহায়ক গ্রন্থ:

১। আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা – ৭৩, ১৪১৯।
২। আমলার মন, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৭।
৩। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা – ৭৩, ১৪০৫।
৪। সাক্ষাৎকার সমগ্র, সত্যজিৎ রায়, পত্রভারতী, ২০২০।

সহায়ক প্রবন্ধ:

১। বিদ্রোহী সত্যজিৎ, উৎপল দত্ত, সত্যজিৎ রায় সংখ্যা, নন্দন বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯২।
২। 'রক্তকরবী' ও স্মৃতিলোক, তপোব্রত ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৪০১।
৩। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী : চিত্রপট থেকে চিত্তপটে, সুশোভন অধিকারী, দেশ পত্রিকা, জুন ২০২১।

সহায়ক পত্রিকা:

১। Frontline Magazine, November, 2021 (The World of Ray) ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। শ্রীমান অর্ক দেবের ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২০-এর ফেসবুক পোস্ট।
২। গুপী বাঘা ত্রয়ীর আলোচনার জন্য You Tube channel-
Ranadeepnaskar23, Gyanpedia, The space link.
৩। সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য You Tube channel-
Prasar Bharati Archives, Filmkopath